চতুর্থ অধ্যায়ঃ

উপসংহার

উপসংহার

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য তার আগেই আন্দোলনে নেমে এসেছে একটি কালো যবনিকা। কেন এমনটা হল, এ নিয়ে আমাদের দেশে সম্প্রতি নানান বিতর্ক উঠেছে। ব্যাপারটা, যেভাবেই দেখা হোক না কেন, কোনরকমভাবেই তা ব্যক্তিগত রুচিভিত্তিক নয়। যে কোন আন্দোলনই, বিশেষত গণ-আন্দোলনগুলির কথা মনে রাখলে, এটা স্পষ্ট হবে যে, ইস্যুভিত্তিক যে-সমস্ত কার্যক্রম, তার কালগত উপযোগিতা নিঃশেষিত হলে একই আন্দোলন সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ কম পায়। অর্থাৎ, ইস্যুভিত্তিক কার্যক্রমের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রগতি লেখক সংঘ আমাদের দেশে গঠিত হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন ঔপনিবেশিক-পরিকাঠামোয় ভারতের নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে একটা গণভিত্তি গড়তে চেয়েছে। তাদের কার্যক্রমেরই একটি অংশ হল এই সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলন। দৈনিক 'স্টেটসম্যানে'র প্রতিবেদকের প্রতিবেদন সম্পর্কে সাজ্জাদ জহীর বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা নেপাল মজুমদার-ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ যে সন্দেহই প্রকাশ করুন না কেন---এর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের মূলে যাঁরা প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উৎসর্গিত কমিউনিস্ট। মস্কো-ফেরত না হলেও এঁরা বিলেত-ফেরত। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় ('তরী হতে তীর')১ অস্বীকার করেন নি একথা যে, তাঁরা লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত হন। তবে একথা ঠিক, প্রগতি লেখক সংঘ যাঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তার সব সদস্যই কমিউনিস্ট নন। সাধারণভাবে যাঁরা যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী, সমাজের অবস্থার বদল যাঁরা চান তাঁদের নিয়েই গড়া হয়েছিল প্রথম সর্বভারতীয় সংঘ। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল, বিবেকী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এবং নৈতিক মূল্যবোধের যাঁরা ধারক ও বাহক ---প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের মাধ্যমে তাঁদের একটি মঞ্চে নিয়ে আসবার প্রয়াস শুরু হয়েছিল প্রথমত এদেশে নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। সে-কথা 'প্রথম অধ্যায়ে' বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। একটি মঞ্চে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে একত্রিত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন রোমাঁ রোলাঁ। একথাও সর্বস্বীকৃত। পরে, অন্তত ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিকবার কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী জোট গঠনের ব্যাপারে আলোচনায় বসে। কিন্তু কোন্ ভিত্তিতে, কোন্ আদর্শে এই ফ্রন্ট গঠন সম্ভব---এ নিয়ে তাঁদের আলোচনাগুলি কোন সঠিক নির্দেশ দিতে সক্ষম হয় নি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে সকলের সম্মতিতে গৃহীত একটি সঠিক সিদ্ধান্ত অতঃপর 'যুক্ত-ফ্রন্টে'র সপক্ষে জরুরিভাবে উপস্থাপিত করে। এতে সুস্পষ্টরূপে মূল দুদলকে তুলে ধরা হয়। একদিকে ফ্যাসিস্টশক্তি, অন্যদিকে বিরোধী জোট। এরপর দেশে দেশে ফ্যাসিবিরোধী একটি সম্মিলিত উদ্যোগের মধ্যে সম্প্রসারিত হয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের পরিকল্পনা। ভারতবর্ষে এমনতর সংঘ গঠনের প্রেরণা হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ করা যায়

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস ও লণ্ডনের লেখক সম্মেলনের কথা। এমন কি মস্কো-লেখক কংগ্রেসের(১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রেরণাও এ-প্রসঙ্গে স্বীকার্য।

দেশে-বিদেশে লেখক সংঘ গঠনের পেছনে কাজ করেছে দুটি জিনিস---একটি, বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা, অন্যটি আরও গভীর---ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করে সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে তুলে ধরে সাধারণের ঐক্যকে সুনিশ্চিত করা। অবশ্য মস্কো-লেখক কংগ্রেস ও কমিন্টার্নের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল---সেটি হল, সর্বহারার একমাত্র স্বদেশ পিতৃভূমি' বা 'দ্য গ্রেট মাদার ল্যান্ড'কে সর্বাত্মক উপায়ে রক্ষা করা। এর জন্যে কমিউনিস্টরা যেন দেশে দেশে গণ-আন্দোলন ও ব্যাপক প্রচার গড়ে তোলেন।

এই দুটি উদ্দেশ্য আমাদের দেশে সংঘ গঠনে প্রথম দিকে অভূতপূর্ব সফলতা এনে দেয়। ব্যাপক প্রচার সংগঠিত হয় এর মাধ্যমে। লেখক সংঘ সর্বভারতীয় স্তরেই শুধু নয়, শাখা সংগঠনগুলি প্রাদেশিক স্তরেও বহু উল্লেখ্য ও স্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে আরও অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায়।

সংঘগঠনে আন্তর্জাতিক-চেতনা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছে, এটা সত্যি কথা। কিন্তু ক্রমে দুর্বলতাগুলিও ফুটে উঠতে শুরু করেছে সংঘের ভেতরে। কারণ, 'যুক্ত-ফ্রন্ট' কার্যক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের একত্রে ঠাঁই দিতে বলা হয়েছিল। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একমত হতে পারেন, তাই বলে রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকেও ঐকমত্য থাকবে তাঁদের, এটা আশা করা যায় না। শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকেই তা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের লেখক সংঘের ভেতরে এদের মানসিকতা(ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতও বটে) ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকে। সাহিত্যকে অবলম্বন করে কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক লড়াইও শুরু হয়ে যায় এই সময়। প্রগতিশীলতার নানান বিচার, নানান মানদণ্ড---নির্দিষ্ট একক বা ইউনিট হিসেবে প্রথমত ছিল ফ্যাসিবাদ, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তা পরাভূত হলে প্রগতির এককসম্পর্কে এরপর অনিবার্যভাবেই আবার নতুন করে তাত্ত্বিক লড়াই শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু তারও আগেকার দু-একটি কথা নিবেদন করা দরকার। এই সংঘে যাঁরা এসেছিলেন, যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত(১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি অভিভাষণও দেন), তিনি প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট বিরোধী, এই সংঘের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতবাদের সংঘাত ছিল অনিবার্য। অতঃপর আর কোন সম্মেলনে তাঁকে দেখা যায় নি। তারাশঙ্করেরও নিজস্ব রাজনীতি ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের মূল ধারাস্রোতের সঙ্গে তাঁর মানসিক-নৈকট্য ছিল, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'গড দ্যাট ফেইলড্' গ্রন্থের অনূদিত বাংলাগ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ ও সংশয় প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। 'পরিচয়ে' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে তারাশঙ্কর

লেখক-সত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁর অভিমানও ব্যক্ত করেন। বুদ্ধদেব বসুও একসময় এই আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ১৯৩৮খ্রীস্টাব্দে প্রগতিশীলতার মানদণ্ডে রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্য 'দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে'১ রাখেন বুদ্ধদেব---এ নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়, সরোজ দত্ত তাত্ত্বিক কিছু বিতর্ক তুলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় চ্যালেঞ্জের ভাষাবোধের ভঙ্গিতে বলেন, 'বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ'। এমনতর সাহিত্য-পরিবেশ কখনও যৌথ-উদ্যোগের সহায়ক বা অনুকূল হতে পারে না। যৌথ-উদ্যোগ তখনই সফল হয় যখন একই দৃষ্টিভঙ্গি ও একই আদর্শের অনুপ্রেরণা সাহিত্যিকদের সহমত পোষণের একটি বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। ১৯৪৪খ্রীস্টাব্দে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' প্রগতি লেখক সংঘের বিকল্প হিসেবে গড়ে ওঠে। সজনীকান্ত দাস, অতুল গুপ্ত, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, কিরণশঙ্কর রায়, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতা ও খ্যাতিমান লেখকেরা এই সংঘে যুক্ত হলেও শক্তি ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে এই সংঘ তেমন ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারেনি প্রগতি লেখক সংঘের। তবুও ক্ষতি হয়েছে বৈ কি। কারণ এঁদের অনেকেই প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যদের দেশদ্রোহী প্রমাণ করতে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বারংবার এই চেষ্টা হয়েছে এবং বলাই বাহুল্য এর শুরু হয় ১৯৪২খ্রীস্টাব্দের 'আগস্ট-আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে।

কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতিগত আদর্শের অনুষঙ্গের শরিক হতে চেয়েছিলেন, ফলত, ১৯৪২খ্রীস্টাব্দের আগস্ট-আন্দোলনের সময় সারা ভারতবর্ষ যখন উত্তাল, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যখন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় আপ্লুত, তখনও কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ বা ব্রিটিশবিরোধিতার তাৎক্ষণিক উত্তেজক নীতিকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি। এই ত্রুটি, কমিউনিস্টদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে দেশের মানুষের কাছে কিছু পরিমাণে ম্লান করে দেয়। বিদ্বিষ্ট রাজনীতিকেরা এই সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। জাতীয় স্বাধীনতার দাবিদার কমিউনিস্টরা নয়---এ কথা প্রচারের ব্যাপকতায় জনমনে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্তি আনে। ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর মতামত উদ্ধৃত করে অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ এসম্পর্কে জানান: 'জনমতের অন্তর্ঘাতকে প্রতিহত করার এবং কৃষক অঞ্চলগুলিতে প্রকৃত জঙ্গী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার, যা প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারীকে রুখতে পারত, একমাত্র পথ ছিল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তার বিরোধিতা করা নয়। জাতীয় আন্দোলনের এই আবর্তনের মুখে, সেই সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে আমাদের মতান্ধ উপলব্ধি ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।'১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব শুধু কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনেও তার ধাক্কা এসে পড়েছে। সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড এই প্রতিক্রিয়ারই পরিণাম। এরকম হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে এরকম তরুণপ্রতিভার মহৎ বিনষ্টিতে অবশ্য একটি ভাল ফলও হয়েছে---তা হল

লেখকদের সংঘবদ্ধতায় নিবিড় ঐক্যবোধ সঞ্চারিত হওয়া। ভীতি ও সন্ত্রাসের বদলে লেখকদের ফ্যাসি-বিরোধিতা এর ফলে তীব্রতা অর্জন করেছে সত্য কথা, তথাপি এতে করে কমিউনিস্ট বিরোধিতা কমে নি। বন্যা-দুর্ভিক্ষ-ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের সময় লেখক সংঘ এগিয়ে এসেছেন যথার্থ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের মানুষের প্রতি কর্তব্যের চেতনা। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের পতনে এঁদের গণমিছিল ও স্বতঃস্ফূর্ত ও উদাত্ত শ্লোগান এক যুগান্তকারী ঘটনা নিঃসন্দেহে। এই মিছিলে যেতে ও এতে সামিল হতে তারাশঙ্কর অস্বীকার করেছিলেন, যদিও লীগ-নেতা লাল মিঞা ও কংগ্রেস-নেতা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এতে সামিল হতে কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষক সমিতির ডাকে তেভাগা আন্দোলন শুরু হলে লেখকদের ভেতরেও প্রকাশ পায় শ্রেণীগত বিরোধিতা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে কমিউনিস্টরা মেনে নিতে পারেন নি, কেননা এই স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যুক্ত ছিল না। এ সময় দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষকে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছিল, কমিউনিস্টদের সমর্থনও ছিল প্রথমাবধি। এ সময়কার উল্লেখ্য ঘটনা হল সোভিয়েট লেখক সংঘের বিচার-সভাকে (১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) কেন্দ্র করে বাংলাদেশে (স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আগে) বিতর্কের ঝড় তোলা। এইরূপ সাইক্লোন-সদৃশ, জদানভের বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রের তত্ত্ব ও বিশ্লেষণকে এদেশেও প্রয়োগের চেষ্টা হয়। এই চেষ্টায় পূর্বানুবৃত্তি হিসেবে কাজ করে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রাদেশিক ও ঘরোয়া বিতর্ক-সভা যা মূলত পরিচালিত হয়েছিল তৎকালীন রাজ্যকমিটির প্রত্যক্ষ নির্দেশে। বিতর্কটি ছিল তাত্ত্বিক। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছিল রজার গারোদি, পিয়ের এরভে ও লুই আরাগঁ-র মাধ্যমে। বিষয় ছিলঃ পার্টি-নির্দেশিত লাইন মেনে লেখক-শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টি করবেন কি না। গারোদি ও এরভের অভিমত হল, কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব বলে কিছু নেই, অতএব সাহিত্যিক-শিল্পীরা কোন নির্দেশিত পথে চলবেন না। আরাগঁ-র অভিমত বিপরীতঃ তাঁর পরামর্শ ছিল, সাহিত্যিক-শিল্পীরাও নন্দনতত্ত্বকেও বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নেবেন, শ্রেণীসংগ্রামে নিজের দায়িত্বকে স্বীকার করবেন। এরভে ও গারোদি-

...দ্বয়কে সমর্থন জানান বিষ্ণু দে, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ

... তারাশঙ্কর প্রমুখ, অন্যদিকে বীরেন্দ্রনাথ রায়, রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত,

...াধ্যায়, অমিত সিংহ প্রমুখ এর বিপক্ষে দাঁড়ান। তীব্র বাদানুবাদ হয় এটা নিয়ে। বাস্তবিক,

...নের সাড়া সবসময় মেলে না। মতান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে মনান্তরও ঘটে

...রও তাই বিরাজ করতে থাকে অনুরূপ অবস্থাও। এই বিতর্কের চরমে দেখা যায়, বিষ্ণু

... 'লোকায়ত' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হন, পরে তাঁরা প্রকাশ করেন 'সাহিত্যপত্র'।

...র কমিউনিস্ট-সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যকে সংগঠিত করার প্রয়াস পান তাঁরা।

এই জের বর্তমান থাকতেই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা-কংগ্রেসের নির্দেশে বি. টি. রণদিভে জওহরলাল নেহরুর বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মজুর নিয়ে সশস্ত্র জেহাদ ঘোষণা করেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীনোত্তর দেশবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা শ্রেণীসংগ্রামের তো বটেই, বিপ্লবেরও অনুকূল ছিল না সে সময়। কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তব প্রেক্ষিত সম্পর্কে যে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পরিণতিতে তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এবংবিধ ত্রুটির মধ্য দিয়েও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবল প্রভাব কমে আসতে থাকে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। পার্টি-কর্মী ও সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধিদের ওপর অগাষ্ট-আন্দোলনের পর থেকে ক্রমাগত সুসংগঠিত অত্যাচার সংঘটিত করা হয়। সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড, জিকমর সেনের হত্যাকাণ্ড, কবি গোলাম কুদ্দুসের ওপর আক্রমণ, সাংস্কৃতিক কর্মী রমেশ দাশগুপ্তের ওপর আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা এর সাক্ষ্য দেয়। সংঘবদ্ধ গুন্ডামি ও সন্ত্রাসের আতঙ্ক বিস্তার করে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-কর্মীদের দৈনন্দিন কাজকর্মকেও প্রায় অচল করে দেবার চেষ্টা হয়।

স্বাধীনতার পরে নেহরুর জাতীয় কংগ্রেস সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য একাডেমি প্রভৃতিতে যে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে তারও প্রলোভন কম ছিল না মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাহিত্যিকদের কেউ কেউ এই সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করেন চাকরি অথবা পুরস্কারের লোভে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে সুধী প্রধান মহাশয় জানিয়েছেন, ভারত সরকারের সাহিত্য একাডেমিতে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন মুলকরাজ আনন্দ।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও এই আন্দোলনকে বিনষ্ট করবার কাজে অনেকখানি দায়ী। ফ্যাসিবাদের অবসান হলেও সাম্রাজ্যবাদ রয়ে গেছে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের শেষতম মুহূর্তে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা কয়েক লক্ষ নিরীহ নাগরিককে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের এর মধ্য দিয়ে দুটি উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছিল। এক, নতুন উদ্ভাবিত দারুণ-বোমার প্রায়োগিক পরীক্ষা, দুই, শক্তি-প্রদর্শনী বা প্রভুত্ব ক্ষমতার দাম্ভিক আত্মপ্রকাশের দ্বারা অপর শিবির বিশেষত সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ব্যাপক অগ্রগতিকে ব্যাহত করা। তাই ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-আন্দোলনের আগে থেকেই তারা বুর্জোয়া সংস্থা, সংগঠন বা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নানা বিভ্রান্তি ও প্রচারকার্য চালাতে থাকে এবং বলাই বাহুল্য, তা কমিউনিজমকে লক্ষ্য করে ও মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে একাডেমিক-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে। ভারতবর্ষের বোম্বে-শহরে আমেরিকান কবি স্পেন্ডারের প্রভাব নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী যে লেখক সম্মেলন আহূত হয় তা ছিল সম্পূর্ণত কমিউনিজম বিরোধী শিবিরের। বাংলাদেশ থেকে অনেকে আমন্ত্রিত হলেও একমাত্র বুদ্ধদেব বসু

সেখানে উপস্থিত হন।'পরিচয়' পত্রিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'খোলা চিঠি' দিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।[২]

অর্থাৎ, সরকারী উদ্যোগ ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উদ্যোগের ফলেও এই আন্দোলন ক্রমে শিথিল হয়ে যেতে থাকে। সংঘশক্তিকে বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন করার অশুভ চেষ্টাও ছিল এর সঙ্গে জড়িত। সমস্যা অন্যত্রও ছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণী, নিম্নবিত্তশ্রেণী, অসহায় উদ্বাস্তুদের আগমনে ভারাক্রান্ত মানুষের সামনে ছিল জটিল জীবনযন্ত্রণার এক পরিবর্তিত বিশেষ পটভূমি , দুটি অন্নসংস্থানের সমস্যাই ছিল যেখানে প্রবল সেখানে অতি সহজেই চাকরি ও নিরাপত্তার দাবিই পায় অগ্রাধিকার। যাঁরা ইস্যুভিত্তিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের স্বপ্নকে লালন করেছিলেন নিবিড় আকাঙ্ক্ষায়, তাঁদের এই পর্বে প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল বিপ্লবী-আবেগকে, এক বিপুল জাতীয় সমস্যার অংশীদার হিসেবে তাঁদের ভূমিকা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মূল আবেগের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল ফ্যাসিবাদ।

সবশেষে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা জরুরি। এই আন্দোলনের আবেগের ছোঁয়া পেয়ে গদ্য সাহিত্যের চেয়ে বেশি কবিতাই রচিত হয়েছে। তবে সব কবিতাই যে খাঁটি ও সফল হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সাময়িক উন্মাদনা বা দুর্দমের আবেগ সর্বদা ভাল কবিতার জন্ম দেবে---এমন ধারণাও ভুল। হয়ত তাই অনেক কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে একই বিষয়, একই প্রসঙ্গ, একই অনুষঙ্গ, একই প্রতীক, একই চিত্রকল্প, সাময়িক প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এমনতর ঘটনা ঘটেছে। মারাত্মক ও ক্ষতিকারক উপাদান-উপকরণ হিসেবে স্লোগানও এই সময়ের এক বিশেষ ত্রুটি। দারিদ্র্যের বর্ণনা বা দুঃখের বর্ণনা অক্ষম কবির হাতে কখনও কখনও আতিশয্যে ও গভীরতার অভাবে অনুভূতিতে কোন স্পন্দন জাগাতে পারে নি, এটাও সত্য। কবিতার শেষ স্তবকে বা পংক্তিতে সূর্যোদয়ের রক্তিম বর্ণপ্রতিভাসের প্রতিচিত্রণ, শ্রমিক কর্মী-হাতের উদ্গ্রীব উত্তোলনের তাৎপর্যহীন অতিব্যাপ্তি, জয় ও আশাবাদের হঠাৎ উদ্ঘোষণা কবিতার বাঁধা গতে বা ফর্মুলায় পরিণত হয়েছিল, এও ঘটনা। সুকান্ত, সুভাষ এবং শেষপর্বের কবিতায় সমর সেন তার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। ফলে কখনও কখনও সূক্ষ্মতা হারিয়ে সাংবাদিকতার প্রকট প্রাধান্য কবিতাকে অধিকার করেছে। সমর সেনের এই রীতি গ্রহণের পেছনকার কারণ অতি-সমালোচনা অথবা সমালোচনার নামে অতি-শাসন। সুকান্ত ও সুভাষ পুরোপুরি পার্টিকর্মী হিসেবে কাব্য রচনা করেছেন। এই আন্দোলনের সৃষ্টি তাঁদের কবিতা বা তাঁদের কবি-প্রতিভা। সুকান্তের কবিতা স্বেচ্ছাসেবকের কবিতা। দৈনন্দিনের কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিয়েই তাঁর কাব্য রচনা। সুভাষেরও তাই। তথাপি সুভাষের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে অলঙ্করণে, ছন্দ-চাতুর্যে আর বিশিষ্ট বাক্-নির্মিতির কারিগরি মেজাজে। অন্যদিকে বিষ্ণু দে পার্টি-কর্মসূচীকে গ্রহণ করেও ('সন্দ্বীপের চর' অবধি) প্রতীকী-ধারার দ্বারা শিল্প-বিনির্মাণ

যেভাবে সম্ভব করে তুলেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। শিল্পের ন্যূনতম দাবিকে বিষ্ণু দে প্রথমাবধি মেনে চলেছেন। তারই সঙ্গে কালের দাবিকে অশেষ দক্ষতায় দিয়েছেন মিলিয়ে।

তবুও আলোচ্য আন্দোলনকে এক কথায় ব্যর্থ বললে সত্যের অপলাপ হবে। এই আন্দোলন রাজনৈতিক দিক থেকে অংশত ব্যর্থ হয়েছে বললেও মানতে হবে যে, সাহিত্যের যা লাভ হয়েছে তার পরিমাণ গুণগতভাবে কম নয়। এর সার্থকতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হল:

১। সৃষ্টিক্ষেত্রে আবেগের সঙ্গে সঙ্গে মননেরও নিবিড় অনুশীলন হয়েছে

২। কবিরা স্বয়ং কবিতাকে জনসাধারণ্যে প্রচারের দায় বহন করেছেন

৩। কবি-সত্তা ও কর্মী-সত্তাকে অবিচ্ছেদ্যরূপে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে

৪। কবিতাকেও সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে আবৃত্তি-শিল্পের পরিবেশন-নৈপুণ্যে উন্নীত করে এবং অধিক সংখ্যক মানুষের দরবারে হাজির করে শ্রুতি-লোভনতার বিশিষ্ট মর্যাদাদান সম্ভব করে তুলেছেন কণ্ঠশিল্পীরা

৫। কবিতায় শ্রমজীবী মানুষ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কৃষক, মজুর প্রভৃতি শ্রেণী-মানুষের নায়কত্ব প্রকাশ পেয়েছে

৬। নতুন মূল্যবোধ ও চেতনা হিসেবে গড়ে উঠেছে গণজীবনের একাত্ম সান্নিধ্য---শ্রেণী-মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি ও মৈত্রীও এই সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে

৭। কবিতার ভাষা ও আঙ্গিকেও প্রকাশ পেয়েছে গণ-জীবনের সান্নিধ্য ও নিবিড় নৈকট্য

৮। সমকালীন বস্তু-উপাদান ও উপকরণকে বা ঘটনাকে কবিতায় ব্যবহার করে কবিরা যুগচেতনা ও কালচেতনা সম্পর্কে রীতিমত আত্মসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই সঙ্গে বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কেও প্রকাশ পেয়েছে চমৎকার আগ্রহ

৯। কবিতা ব্যক্তিগত সৃষ্টি নিঃসন্দেহে, তথাপি গুরুত্ব পেয়েছে সামষ্টিক-চেতনা, মান্য হয়েছে সর্বহারার সার্বিক একতা

১০। সমর সেনের ভাষায়(তৃতীয় অধ্যায়, 'সমর সেনের কবিতা' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মার্কসবাদী চিন্তার অনুশীলনচর্চার ফলে 'সিনিসিজমে'র ঝোঁক কেটে গিয়ে নতুন চেতনা লাভ করা সম্ভব। তাই প্রকারান্তরে কবিতা বহন করেছে আদর্শবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ যা অনেক কবিকে বুর্জোয়া-ব্যবস্থার অবক্ষয় থেকে, পতন থেকে অনিবার্যভাবে রক্ষার প্রয়াস পেয়েছে। এই আন্দোলন, বিশেষ করে প্রেম ও যৌনতার, বিশৃঙ্খলা ও বিকারের হাত থেকেও তাঁদের রক্ষা করেছে। কবিতায় তার প্রভাব সহজেই অনুভব করা যায়।

১১। কোন একটি বা দুটি দশক পুরোপুরি পরিসংখ্যানের দিক থেকেও বোধহয় এত কবির জন্ম দিতে পারে নি। খ্যাত ও অখ্যাত কবিদের এইরকম বিচিত্র চিত্তাকর্ষক সম্মিলনের কারণগুলি যাই হোক, উদ্যম, সংঘবদ্ধতা,

সংগ্রামী-চেষ্টা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতা ও প্রবল উচ্ছ্বাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিকও আছে। যা সমাজের উপরিতলের সাংস্কৃতিক-চেতনাকে একটি ধাক্কা দেবার মত প্রবল ঘটনাও বটে।

১২। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ছিল মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ও শোষণের বিরুদ্ধে যুগসঞ্চিত প্রগাঢ় বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ,---সে-বিক্ষোভের অবসান সম্ভব শ্রেণী সংগ্রামের সাফল্যে, সে-বিজয় অর্জিত না হওয়া অবধি এই আন্দোলন বাহ্যিক দিক থেকে বিনষ্ট হলেও, অন্তরে অন্তরে সে অন্তঃফল্গুধারার মত তার ক্ষোভ ও প্রতিবাদ বহন করতে থাকবে আগামী দিনগুলিতেও যা আমরা সত্তর দশকের নকশাল-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত কবিতাগুলিতে লক্ষ্য করেছি মাত্র দুটি দশকের সামান্য ব্যবধানে।

অতঃপর সঙ্গতভাবেই একথা বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করে তোলবার জন্য ঐতিহ্য হিসেবেও এই আন্দোলনের রয়েছে এক অপরিসীম গুরুত্ব। যখন কোন আন্দোলন তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাময়িকতা পার হয়ে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে দেয় তার সুদীর্ঘ হাত তার গভীর প্রভাবে ও সমমর্মিতায়, প্রকৃতবোধের সহযোগে ও সামাজিক দায়বোধের ঐকান্তিকতায় তখন তার গুরুত্বটুকু সম্পর্কে সংশয়ের তেমন অবকাশ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির এই আন্দোলন উঠে এসেছিল বঞ্চিত মানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ভেতর থেকে, এর বিস্তৃত শেকড় প্রোথিত ছিল অসংখ্য মানুষের কল্যাণের আত্যন্তিক কামনায়। সততার মানবিকতাই ছিল এর মূলমন্ত্র। অজস্র ত্রুটি সত্ত্বেও এর সার্থকতা এইখানে। এই কারণে সম্ভবত যাঁরা সত্তর এবং আশির দশকে বাংলায় রাজনৈতিক-কবিতা লিখছেন, তাঁরা বারবার চল্লিশের দশকের কবিদের প্রগতি-আন্দোলন-অনুপ্রাণিত কাব্যধারাকে নতুন করে পর্যালোচনা করার এবং সেই ঐতিহ্যকে পরিবর্তিত পটভূমিতে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। নরহরি কবিরাজঃ স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৮, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃঃ ২২৬

২। পরিচয়, বিংশবর্ষ, দ্বিতীয় খন্ড, ১ম সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৭-৫৮বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫১-৫৪